ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue- IV, March, 2025, Page No. 951-957
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.04W.089

অবিভক্ত দক্ষিণ ত্রিপুরার লোকসংস্কৃতি ও লোকাচার

বিশ্বজিত দেবনাথ, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, ওয়াই. বি.এন ইউনিভার্সিটি, রাঁচি, ঝাড়খণ্ড, ভারত*

Received: 20.03.2025; Send for Revised: 21.03.2025; Revised Received: 22.03.2025; Accepted: 30.03.2025; Available online: 31.03.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

One of the hill states of Tripura. Although the state is currently divided into eight districts. Earlier there were four districts. One of them is undivided South Tripura. The folk culture of the Hindu Bengali public life here therein lies their tradition. Starting with the ethos here analysing proverbs and folk song rhymes shows that, it is rich and steeped in tradition.

Keyword: Folk culture, undivided, south Tripura, Ethos, Hindu, proverbs, Vow of Ashwin, flower bishu, Chaitra porab.

অবিভক্ত দক্ষিণ ত্রিপুরা বলতে বর্তমান ত্রিপুরা রাজ্যের গোমতী জেলা ও দক্ষিণ জেলাকে যুগ্মভাবে বলা হচ্ছে। পূর্বে এই উভয় জেলা দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। দক্ষিণ ত্রিপুরার সীমানা ছিল একান্ন পিঠের এক পিঠ ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির তথা উদয়পুর থেকে ধরে কিল্লা-অম্পি-অমরপুর-করবুক-রুপাইছড়ি-সাতচান্দ-ঋষ্যমুখ রাজনগর-কাক রাবন হয়ে আবার উদয়পুর। প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে এই সীমানা তথা দক্ষিণ জেলাকে দুটি জেলায় রূপান্তরিত করা হয়। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের দ্বারা বিভিন্ন সরকারী পরিষেবা জনগনের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ২০১১ সালে পূর্ববর্তী দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাটি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা, বিলোনিয়া এবং গোমতী জেলা, উদয়পুর গঠিত হয়। দক্ষিণ জেলার মোট ভৌগোলিক এলাকা ১৫১৪.৩২২ বর্গ কিলোমিটার। ২০১১ সালের আদমশুমারির তথ্য অনুসারে জেলার মোট জনসংখ্যা ৪,৩০,৪৯৯ জন। এই জেলায় তিনটি মহকুমা, আটটি ব্লক, দুইটি পৌরসভা পরিষদ, একটি নগর পঞ্চায়েত রয়েছে। দক্ষিণ জেলার ২০৪.৪৮৭ কিলোমিটার জুড়ে বাংলাদেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সীমানা রয়েছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক এখানে বাস করে। হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি-পাহাড়ি এখানে ভাই ভাই। এখানকার মানুষ বাংলা-ককবরক ও বিভিন্ন স্থানীয় ভাষায় কথা বলে। কৃষিকাজ প্রধান পেশা হলেও অন্যান্য পেশার সঙ্গেও যুক্ত রয়েছে। এখানকার বাঙালি হিন্দু জনগণ ভারতবর্ষভূক্ত এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের সময়কালে বাংলা দেশের বৃহত্তর নোয়াখালী জেলা লক্ষীপুর ফেনীথে কেউ উদ্বাস্তু হয়ে এসেছিল। এরাই বর্তমানে দক্ষিণ ত্রিপুরায় আদিবাসী ত্রিপুরা জাতিগোষ্ঠীকে ছাপিয়ে প্রধান জাতিগোষ্ঠী হয়ে উঠেছে। এই বৃহত্তর হিন্দু জনগোষ্ঠীর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে থাকা লোক সংস্কৃতির প্রাসঙ্গিকতাই আমার আলোচনার বিষয়।

উদয়পুরে সদর দপ্তরের সাথে গোমতী জেলাটি ২০১২ সালে নির্মিত হয়েছিল। অক্টোবর ২০১২ সালে প্রশাসনিক পুনগঠনের অংশ হিসেবে উদয়পুর, অমরপুর এবং নবগঠিত করবুক মহকুমা সহ গোমতী জেলাটি পূর্ব-দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার একটি বিচ্ছিন্ন সংস্করণ হিসেবে তৈরি করা হয়েছিল। এই গোমতী জেলার জনজীবন গোমতী নদীর জলস্রোতের মতোই প্রবহমান। এখানে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করলে ও অধিকাংশ হিন্দু।

এখানকার পাহাড়িরা ও হিন্দু ধর্মীয় আচার আচরণকে আকড়ে ধরে জীবন অতিবাহিত করেন। বিভিন্ন ধরনের ঐতিহ্যবাহী লোক-সংস্কৃতির নিদর্শন এখানকার প্রতিদিন কার জীবনের অঙ্গ। পাহাড়ের আকা বাকা অরণ্বেষ্টিত গোমতী জেলার প্রধান আকর্ষণ হয়ে উঠতে পারে লোক-সংস্কৃতি কেন্দ্রিক জীবন যাত্রাটি। সেই লক্ষ্য মাত্রাকে সামনে রেখেই আমার ত্রিপুরা রাজ্যের আমার গোমতী জেলা ও পাশ্ববর্তী দক্ষিণ জেলা তথা অবিভক্ত দক্ষিণ ত্রিপুরার বাঙালি হিন্দু জনজীবনের লোক-সংস্কৃতি চর্চায় এগিয়ে আসা।

লোকাচার:

লোক-সংস্কৃতি ও লোকাচার হল লোকসাধারণের কৃষ্টি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যগত কিছু আচার। এগুলো তারা বংশ পরম্পরায় পালন করে থাকে। অবিভক্ত দক্ষিণ ত্রিপুরার জনজীবনে প্রচলিত রয়েছে এমন বহু লোকাচার যেগুলোর মধ্যে দিয়ে তাদের বিশ্বাস-আশ্বাস, জীবন ধারণ ও ধরন ফুটে উঠে। যেমন আশ্বিনের ব্রত। কথিত আছে স্বর্গের চিকিৎসকদ্বয় অশ্বিনীদ্বয়। সবার ধারণা এদের ব্রত রোগ ব্যধি থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। এই ব্রত আশ্বিন মাসের শেষ তারিখে হয়। মজার ব্যাপার এই ব্রতের প্রসাদ খাওয়া হয় পরদিন তথা কার্তিক মাসের পহেলা তারিখে । তাই প্রচলিত রয়েছে:

"আশ্বিনে রান্দে কার্তিকে খায়,
যে বড় মাগে সেই বর পায়।"[১]

আশ্বিনের শেষ তারিখে দুইটি মাটির পাতিলে আতব চাল বা খাসা চালের ভাত রান্না করা হয়। রাতের বেলায় সেই পাতিল দুটোতে জল দিয়ে তুলসী পাতা দেওয়া হয়। পরিবারের সকলের বিঘত মেপে পাটের শোলা ভাতের মধ্যে সমানভাবে পুঁতে দেওয়া হয়। তাতে নাকি ভাগ্য পরীক্ষা করা হয়। কার্তিক মাসের প্রথম দিন সকালবেলায় যার যারটা পরীক্ষা করে দেখে। যার শোলা যত বেশি লম্বা হয় তারা নাকি তত ভাগ্যবান। তারপর গুড় কলা নারকেল দুধ মেখে সে ভাত সবাই খায়। পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজনদেরকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়। কেউ কেউ পরিবারের সদস্য যতজন তত পাতিল রান্না করেন।

আরেকটি লোকাচার হলফুল বিশু বা হার বিহু। ফুল বিহু হল চৈত্র পর্বের বা চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিন। দক্ষিণ জেলার হিন্দু বাঙালি এই দিন পর্বের জন্য খুব ভোরবেলা থেকেই ফুলতলা শুরু করে। এই ফুল তোলার দিনকে ফুল বিশু বলে। ফুল তুলে নানা রকমের মালা গাথা হয়। সন্ধ্যার সময় শুকনো বিষকাডালি বিশল্যকরণী ঔষধি পোড়ানো হয়। সাথে সাথে উচ্চস্বরে বলে ওঠে জাগোরে জাগো, টাকা পয়সা ধনসম্পদ সুখ-শান্তি জাগো। আবার গোমতী জেলাতে দেখা যায় এখানকার হিন্দু বাঙালিরা সকালে ঘুম থেকে উঠে মুখ ধোয়ার আগেই লতাপাতার শাকের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। চোখের সামনে যেসব লতা পাতা দেখতে পায় বিশেষ করে নিমপাতা, ডিমাই শাকের মিশ্রণে তৈরি করেন এক ধরনের রস। বাড়ির ছোট থেকে বড় সকলকেই মুখ ধোয়ার আগেই এই রস খেতে দেন। তাদের বিশ্বাস এটা খেলে আগামী বছরটি তারা বিনা রোগে কাটাতে পারবেন।

এমনই আরেকটি লোকাচারের কথা আমরা উল্লেখ করতে পারি। সেটি হল চৈত্রপরব বা চৈত্র সংক্রান্তি। চৈত্র মাসের শেষ দিন পরব সংক্রান্তি। এই দিনটি বাঙালিদের বড় খুশির দিন। এই দিনটির জন্য অনেকদিন আগে থেকেই চিড়া খৈ মুড়ি ও নাড়ু ঘরে ঘরে বানিয়ে রাখা হয়। পরের দিন সকাল বেলা বাড়ির চারদিকে চার টুকরি মাটি ও উঠানের মাঝখানে এক টুকরি মাটি দেওয়া হয়। মহিলারা উঠুন বাড়ি পরিষ্কার করে গোবর দিয়ে বাড়ির দরজায় বাদ দিয়ে ফুল সাজিয়ে দেয়। তারা সবাই স্নান সেরে নতুন পোশাক পড়েন। যদি নতুন পোশাক কিনতে না পারে তবে সবাই একটি করে নতুন তাগা বা কাইতন পড়ে নেয়। পুরুষেরা কাঁচি দিয়ে বাড়ির বাইরে মাটি একে খই ছিটিয়ে দাগ কাটে। একে বলে হত্তর কাটা। মানে শত্রুকে কাটা। মহিলারা ফুল ও ফুলের মালা দিয়ে সব ঘরের দরজা সাজিয়ে নেয়। তারপর বসে পাচন তৈরি করার কাজে লেগে যায়। নানা রকমের সবজি কাটে। কাঁঠালের ইচর, পাচন ঝোল রান্না করে। তাদের বিশ্বাস এই পাচন ঝুল খেলে নানা রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। তারপর সবাই মিলে মুড়ি নাড়ু খেয়ে পাচন খায়। চৈত্র সংক্রান্তির দিন বিকাল বেলায় সবাই যায় ঐতিহ্যবাহী চড়ক মেলায়। এমন আরো অনেক ব্রত বিশ্বাস লোকাচার প্রচলিত রয়েছে অবিভক্ত দক্ষিণ ত্রিপুরার হিন্দু বাঙালি জনজীবনে।

প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচন:

অবিভক্ত দক্ষিণ ত্রিপুরার হিন্দু বাঙালি জনজীবনে প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচনের মধ্যে দিয়ে তাদের সংস্কৃতির দিকটি প্রতীকায়িত হয়ে উঠেছে। ত্রিপুরার জনজীবনে প্রবাদ প্রবচনের স্বতন্ত্রতা রয়েছে। অবিভক্ত দক্ষিণ ত্রিপুরার প্রবাদ-প্রবচনে বাংলাদেশের অঞ্চল ভিত্তিক প্রভাব থাকলেও রয়েছে নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষার প্রবাদ। এই প্রবাদের মাধ্যমে এখানকার হিন্দু বাঙালি জাতির সভ্যতা ও সমাজ সংস্কৃতি আবিষ্কার করা যায়। কারণ প্রবাদ হল লোক পরম্পরাগত বিশেষ এক ধরনের উক্তি যা এখানকার মানুষ নিত্য নৈমিত্তিক চলার পথে ব্যবহার করে। দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতায় অবিভক্ত দক্ষিণ ত্রিপুরায় হিন্দু বাঙালি জনজীবনে প্রচলিত প্রবাদ প্রবচন গুলি সম্মৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। নিম্নে সেরকম কিছু প্রবাদ প্রবচনের তাৎপর্য তুলে ধরলাম।

"আইল্লার আল জাইল্লার জাল"[২]

আইল্লা এখানকার আঞ্চলিক শব্দ। আইল্লা শব্দের অর্থ যিনি হাল চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করেন অথাৎ চাষি বা কৃষক। আর আল শব্দের অর্থ এখানে হাল বা লাঙল যেটির সাহায্যে জমিকে চাষের উপযোগী করা হয়। জাইল্লা হলেন তিনি যিনি জাল ফেলে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করেন। জাল বলতে মাছ ধরার জন্য ব্যবহৃত জাল টি। তাৎপর্য হল এই যে, কৃষকের কাছে লাঙ্গল যেমন মূল্যবান তেমনি জেলের কাছে তার জালটিও মূল্যবান।

"নাইচ্তো ন জাইনলে উডান বেঁয়া"[৩]

নাইচ্তো বলতে এখানে নাচ। ন জাইনলে অথাৎ নাচতে না জানলে। উডান হল উঠোন বা আঙ্গিনা। বেঁয়া হল বাঁকা। অর্থাৎ নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা। তাৎপর্য হল নিজের অক্ষমতা প্রকাশ না করে কোনো বাহানা ধরে বা অপরকে দোষারোপ করে নিজের অসফলতার জন্য অন্যের ঘারে দোষ চাপিয়ে নিজের সম্মান বজায় রাখতে চায়।

"পোলা নষ্ট আঁডে-বউ নষ্ট ঘাটে"[৪]

পোলা হল ছেলে সন্তান। আঁডে বলতে হাটে বা বাজারে, পুরুষ মানুষ রা যেখানে বেশি যায় । ঘাটে হল পুকুর বা নদীর ঘাট, যেখানে মেয়ে মানুষ বেশি যায়। তাৎপর্য হল ছেলেমেয়ে সবসময় বাজারে গেলে কিছু না কিছু খারাপের সম্ভাবনা থাকে। কারন এখানে হরেক রকমের মানুষ আসে। ঠিক সেরকম পুকুর বা নদীর ঘাটে নানা মহিলা আসে। সেখানে বউদের কেউ না কেউ তাকে কুপরামর্শ দিতে পারে।

"মজা মাইচ্ছে গুজা হুতে
টর হাইবা আডাই নিতে"[৫]

এখানে মজা মাইচ্ছে বলতে মজা মেরেছে বা জিতেছে। গুজা হল কুব্জ যার কোমড় ভাঙা। হুতে বলতে পুত্রে। টের হাইবা ব্যবহৃত হল বুঝতে পারা অর্থে। আডাই নিতে অর্থাৎ হারিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময়। তাৎপর্য হল কাউকে ঠকাতে গেলে নিজেও ঠকতে হয়। চতুর ঘটকের দ্বারা এক কুব্জ ছেলের সাথে এক পঙ্গু মেয়ের বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে। তখন ছেলের বাবা বলছে তার কুব্জ ছেলে জিতে গেছে। তখন মেয়ের বাবা বলে বুঝতে পারবে হাটিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময়। এমন বহু প্রবাদ প্রবচনের সন্ধান পাওয়া যায় অবিভক্ত দক্ষিণ ত্রিপুরার হিন্দু বাঙালি জনজীবনে যেগুলোর মধ্য দিয়ে তাদের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক তথা সার্বিক চেতনার বহিপ্রকাশ ঘটেছে।

ব্যবহৃত লোকশিল্প:

অবিভক্ত দক্ষিণ ত্রিপুরার লোকসমাজ নিজেদের সংস্কৃতি অনুযায়ী পেশা আর আমোদ-প্রমোদের সঙ্গে মিলিয়ে ব্যবহার করে বহু লোকশিল্প। এই শিল্পগুলির মধ্যে দিয়ে তাদের আচার-আচরণ, বিশ্বাস-সংস্কার, রুচিবোধ সব কিছুরই পরিচয় পাওয়া যায়। লোকশিল্পের সৃজন ভাবনায় সম্পৃক্ত থাকে লোক লোকধর্মও। লোক শিল্প লোক বৃত্তের অন্তর্গত। লোক শিল্পীরা আনুষ্ঠানিক ভাবে শিক্ষা প্রাপ্ত নয়। তারা সৃষ্টির ক্ষেত্রে ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে সর্বোপরি অশিক্ষিত পটুত্ব দিয়েই তাদের এই সৃষ্টি প্রয়াস চালিয়ে যায়। জন্ম বিবাহ মৃত্যু সহ সব অনুষ্ঠানে লোক শিল্পীদের সৃজন প্রতিভার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। লোক শিল্প ঐতিহ্যগত ভাবে প্রজন্ম পরম্পরায় হস্তান্তরিত হয়।

আলপনা:

বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নানা আলপনা শিল্পের ছড়াছড়ি লক্ষ্য করা যায়। এর উপকরণ নিতান্ত সামান্য। চাল গুড়ি করে পিটালি তৈরি করে, তাতে ন্যাকড়া ভিজিয়ে শুধুমাত্র আঙুলের টানে আঁকা হয় আলপনা। চালগুড়ি ছাড়াও

পোড়া তুষ, ডালের গুঁড়ো আলপনা আঁকার কাজে ব্যবহৃত হয়। আলপনা হল ব্রতের আনুষ্ঠানিক অলংকরণ। আলপনাতে শিল্পীর শিল্পী কথার প্রকাশ যেমন রয়েছে, তেমনি এখানে চাওয়া-পাওয়ার ইচ্ছা ও প্রকাশ পায়। অবিভক্ত দক্ষিণ ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলে তাদের বাড়ি ঘরের দেওয়ালেও আলপনা দেখতে পাওয়া যায়। এমনকি কিছু গ্রাম রয়েছে যেগুলো ছবি গ্রাম, শিল্পী গ্রাম, দেবী গ্রাম নামে নামাঙ্কিত হয়েছে শুধু মাত্র এই আলপনা শিল্পের কারণে।

কাঠ খোদাই শিল্প:

পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরা। এখানে লোক জীবনে কাঠ খোদাই শিল্পের অনেক কদর রয়েছে। বাড়ির আসবাব পত্র থেকে শুরু করে দেব মন্দির পর্যন্ত কাঠ এখানকার অপরিহার্য অঙ্গ। আমাদের ত্রিপুরা যখন স্বাধীন রাজ্য ছিল সেই রাজ আমল থেকে এখানে কাঠ শিল্পের প্রচলন চলে এসেছে। এখনো সেই কাঠ শিল্পের কদর রয়েছে সমান মাত্রায়। বাড়ি ঘরের দরজা জানালা থেকে শুরু করে প্রতিদিনের ব্যবহার সামগ্রিতে কাঠশিল্প এখানকার লোকজীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে রেখেছে।

কুষ্ঠী নির্মাণ:

এখানকার লোক সাধারণের লোক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কুষ্ঠী নির্মাণ একটি গুরুত্ব পূর্ণ লোকশিল্প। শিশুর জন্মের পর তার ভাগ্যে কি রয়েছে তা জেনে নেবার আগ্রহ বা কৌতূহল থাকে সকল মানুষের। হস্তরেখা গণনা করে ভাগ্য জানার ইচ্ছাতো সারা পৃথিবীর মানুষের মধ্যে রয়েছে। লিখিত ভাবে ভাগ্য জানার জন্য কুষ্টি তৈরি করানো হয়। ভাগ্যকে জেনে নেওয়া মানুষের জীবনে গ্রহ নক্ষত্র কতখানি প্রভাব ফেলছে তা জানার জন্য অতীতেও আগ্রহ ছিল। যা আমরা জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কে জানি। যারা জ্যোতিষবিদ্যা জানেন তাদেরকে দিয়েই এখানকার লোক সাধারণরা তৈরি করেন কুষ্ঠী। এই কুষ্ঠীর মধ্যে আঁকা থাকে একটি ভাগ্যচক্র। কুষ্ঠীপত্রটিতে যে নকশা সেই নকশা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা সম্পন্ন লোকশিল্প বলে মনে করতে পারি।

পাখাশিল্প:

ত্রিপুরা রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলে বিভিন্ন জিনিসের সাহায্যে তৈরি পাখা ব্যবহার দেখা যায়। যেমন তাল পাতার পাখা, বাঁশের পাখা, সুপারি আশের পাখা, গমের ডাঁটার পাখা, সুতার পাখা, উলের পাখা, ময়ূরের পালকের পাখা। এককালে বিশালাকৃতির তাল পাতার পাখায় রাজা জমিদাররা হাওয়া খেতেন। তবে ছোট আকারের তাল পাতার পাখাই বহুল ব্যবহৃত হয়। এগুলোকে হাত পাখা বলে। আগে বৃহদাকৃতির তাল পাতাটিকে হাত পাখার আকারে ছাটাই করে নেওয়া হয়। তারপর সেটিকে জলে ভিজিয়ে রাখা হয়। ভিজিয়ে রাখার ফলে এটি নরম হয়। একটি পাতা দিয়ে দুটি পাখা হয়। পাখার উপযোগী করে পাতা এবং ডাটা ছেটে নেওয়া হয়। তাল পাতার উভয় পিঠে গোল করে বেতের বেষ্টনী দিয়ে সুতা দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়। পাখাটির দুই পিঠে নকশা ও আঁকা হয়। ফলে এটির সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। পাখাটির চারদিকে কাপড়ের ঝালু লাগানো হয়। আবার রংতুলির সাহায্যে ভাজ পাখাতে ছবি ও আঁকা হয়। বাঁশের বেত দিয়ে তৈরি নকশাযুক্ত পাখা আকারে চারকোণ বিশিষ্ট হয়। বাঁশ থেকে বেত তৈরির উপর পাখা সৌন্দর্য অনেকখানি নির্ভর করে। বেত তোলা হয় কচিবাঁশ আর পাতলা দায়ের সাহায্যে তারপর আড়াআড়ি রাখা বেতের এমন ভাবে ভাঁজতোলা হয় যাতে একধরনের নকশা ফুটে ওঠে। বেতের শেষপ্রান্ত মোরে দেওয়া হয় বা কেটে ফেলা হয়। আবার গোলাকার বাঁশ চতুষ্কোণে ভিন্ন ধরনের বেত দিয়ে মাথা মুড়ে দেওয়া হয়। একপ্রান্তে একটি হাত যুক্ত করা হয়। হাতলটি মোলায়েম ও নানা কারুকার্য থাকে। তবে এমন করে বানানো হয় যে একটি চোঙার মাঝখান দিয়ে সেটির তলটিকে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। চোঙা ধরে ঘোড়ালেই পাখাটি ঘুরবে আর শীতল বাতাস প্রদান করবে।

সুপারি আশের পাখাটি ও খুব গুরুত্বপূর্ণ এখানকার জনজীবনে। সুপারি গাছের খোল জলে ভিজিয়ে রেখে নরম করা হয়। তারপর তা থেকে আঁশ তোলা হয়। কাজটি খুব কষ্ট সাধ্য। আশ বের করার পর সেটির উপর সুতার কাজ করে পাখা তৈরি করা হয়। সুপারির আশের উপর কখনো কখনো রঙের প্রলেপ দেওয়া হয় আবার কখনো রং দিয়ে নানা লতা পাতা বা ছবি আঁকা হয়। গম কাটা হয়ে গেলে শুকনো ডাটা গুলো সংগ্রহ করা হয়। সেগুলো পরিষ্কার করে নেওয়া হয়। এই ডাঁটাগুলোকে সলার মত করে নেওয়া হয়। সেগুলো সুতো দিয়ে মোটামুটি ভাবে গেঁথে নিয়ে গমের

ডাটার পাখা তৈরি করা হয়। সুতা দিয়ে বাউল দিয়ে নির্মিত নানা নকশায় সজ্জিত হয় সুতার পাখা বাউলের পাখা। ময়ূরের পালক পরপর সাজিয়ে তৈরি করা হয় ময়ূরের পালকের পাখা।

লোক বিশ্বাস বোধ:

লোকসংস্কৃতির আলোচনায় মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের গুরুত্ব রয়েছে। লোক সাধারণের মনস্তাত্ত্বিকতার দিকটি লোকাচার ও লোক সংস্কার বিশ্বাসের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। কারণ মানুষের চিন্তাধারায় যে সংস্কারগুলি আজও প্রবহমান তার মূলে মননের সমর্থন রয়েছে। এই লোকবিশ্বাস এক কথায় লোকমানুষের সামাজিক বিজ্ঞান। দৈনন্দিন জীবনে চলার পথে এগুলি লোকসমাজের আইন হয়ে উঠেছে। পূর্বপুরুষ থেকেই এগুলি লালিত হয়ে আসছে। এই অলিখিত আইন বা নিয়ম লোকমানুষরা অস্বীকার বা বিরোধিতা করতে চায় না। যদিও আধুনিক প্রযুক্তি ও নাগরিক সংস্কৃতির কারণে ক্রমশ লোক বিশ্বাস সংস্কার গুলি কোনঠাসা হয়ে আসছে। কিন্তু এটা অস্বীকারের উপায় নেই যে মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিটি পর্যায় বিভিন্ন লোক বিশ্বাসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এবং আজও হচ্ছে। লোক বিশ্বাস গুলির অভ্যন্তরে কখনো কখনো বৈজ্ঞানিক যুক্তিও অনুধাবিত হয়। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ক্ষুদ্র রাজ্য ত্রিপুরা। এখানকার প্রাত্যহিক জীবনে নানা লোক বিশ্বাসের দ্বারা লোক সাধারণরা নিজেদের পরিচালিত করে। উত্তরাধিকার সূত্রে পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে প্রাপ্ত বহু বিশ্বাস ও সংস্কার বহন করে নিয়ে চলছে। নিম্নে সেরকমই কিছু লোকবিশ্বাস ও সংস্কার তুলে ধরা হলো:

ভোজন বিষয়ক লোক বিশ্বাস:

১) "খাওয়ার সময় পাত নড়লে অমঙ্গল হয়"। জীবনে কোন কিছুর স্থায়িত্ব থাকে না। মন সবসময় চঞ্চলময় থাকে। নির্দিষ্ট একটি কাজে মনোনিবেশ সম্ভব হয়ে ওঠে না। লক্ষ্যের অভিমুখে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য স্থির থাকে না। বৈজ্ঞানিক যুক্তি আবিষ্কার করলে দাঁড়ায় খাওয়ার ব্যাঘাত ঘটাতে পারে, নানা শারীরিক সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।
২) অন্ধকারে কোনো খাবার খেতে নেই।
৩) অমাবস্যার দিন আমিষ খাবার খাওয়া নিষেধ।
৪) অম্বুবাচীর সময় আম ও দুধ খেতে হয়।
৫) আমের পোকা খাওয়া ভালো।
৬) আশার পঞ্চমীতে ঢেঁড়স খেতে নেই।

বিবাহ বিষয়ক লোকাচার:

১) আশীর্বাদের পর থেকে বিবাহ পর্যন্ত শারীরিক কাঁটা চিরা অমঙ্গল।
২) দধিমঙ্গল হয়ে গেলে খালি পায়ে হাঁটা চলা এবং একা চলা অমঙ্গল।
৩) বিবাহের দিন সড়া দিয়ে যত জল মাপা হয় ততই নাকি বৈবাহিক জীবন সুখের হয়।
৪) পাশা খেলার সময় করি নড়ার শব্দ হলে সংসারে ঝগড়াঝাটি বেশি হয়।
৫) বিবাহের পরের দিন কাল রাত্রিতে স্বামী স্ত্রী পরস্পরের মুখ দেখলে অমঙ্গল হয়।
৬) বিবাহের পরের দিন স্বামীর ঘরে যাওয়ার আগে স্ত্রীর ভাই গিয়ে সেই ঘরের চালে বেতের বাঁধ দিতে হয়। তাতে নাকি বোনের উপর ভাইয়ের নিরাপত্তা থাকে।
৭) বিবাহের দিন বউয়ের প্রস্রাব ভেজানো সলতে পুড়িয়ে কালি তুলে সেই কালি বরের কপালে ফোঁটা দিলে বর বউয়ের কথা মত চলে।

দৈনন্দিনের লোক বিশ্বাস:

১) এক ডাক দেওয়া কিংবা এক ডাকে উত্তর দেওয়া অমঙ্গল।
২) ব্যাঙের সঙ্গে ব্যাঙের বিয়ে দিলে বৃষ্টি হয়।
৩) একমাত্র কন্যার মাথায় চালনি দিয়ে তার উপর জল ঢাললে বৃষ্টি হয়।
৪) ঝড় বৃষ্টির সময় এক শ্বাসে ঘরের কোনায় দা দিয়ে কোপ মারলে ঝড় বৃষ্টি থেমে যায়।

৫) বৃষ্টির সময় বসার পিড়ি উল্টিয়ে বাইরে ফেললে বৃষ্টি বন্ধ হয়।
৬) রাতের বেলায় ঘরের নোংরা বাইরে ফেলতে নেই।
৭) আত্মীয়ের বাড়িতে উচ্ছে করলা নিয়ে গেলে সম্পর্ক নষ্ট হয়। লংকা দিলে সম্পর্ক জ্বালাময় হয়।
৮) নতুন সম্পর্ক তৈরি সময় টক জাতীয় খাবার খেলে সম্পর্কের মাধুর্য থাকে না।
৯) আমের পোকা বা পিঁপড়ে খেলে সাঁতার শেখা যায়।
১০) একবার খেলে জলে পড়ে মৃত্যু হয়।

ইত্যাদি বহু বিশ্বাস সংস্কার অবিভক্ত দক্ষিণ ত্রিপুরার লোক জনজীবনে বয়ে আসছে।

লোকগান:

অবিভক্ত দক্ষিণ ত্রিপুরার জনজীবনে প্রচলিত গানগুলিকে এককথায় বলা যায় নারীদের নিজস্ব সম্পদ। নানা লোকাচারের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেই গানগুলি গীতহয়। বিশেষ করে এখানকার বিবাহের গানগুলি বেশ আকর্ষণীয়। এগুলোকে যথার্থ অর্থে মেয়েলি গান বলা যায়। এসব সংগীত যতখানিনা কোন সংগীত রচয়িতা কর্তৃক রচিত তার থেকেও বেশি হল এসব গান একেবারেই নিজেদের রচনা। এগুলোকে সমাজের দর্পণও বলা যায়। নারীরা তাদের আনন্দ-বেদনা, দেশাচার-লোকাচার, সামাজিকরীতি-নীতি ঐতিহ্যগত নানান দিকগুলোকে গানের সাহায্যে ব্যক্ত করে। গানগুলোর উপস্থাপনায় কোন কৃত্রিমতা নেই। অত্যন্ত সহজ সরলভাবে গানগুলো পরিবেশিত হয়। গ্রামীণ নারীরা তাদের স্বাভাবিক কণ্ঠে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে আন্তরিকতার সঙ্গে গানগুলি পরিবেশন করেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো গানগুলিতে পারিবারিক বন্ধনের উপরেই বেশি জোর দেওয়া হয়। এসব গানের অধিকাংশই অলিখিত। ঐতিহ্য পরম্পরায় বেঁচে থাকে গানগুলো। তাই এগুলোকে বলা যায় সমষ্টিগত সামাজিক সৃষ্টি। গানগুলোতে সমষ্টি মননের চেতনা অনুভূতির প্রকাশ ঘটে। বিবাহের গান ছাড়াও ব্রতের গান অন্যান্য পূজার গান মেয়েলি গান এখানে শুনতে পাওয়ার যায়। বিভিন্ন ধরনের গান আমরা এখানে শুনতে পাই সংস্কারমূলকগান, বিবাহ বিষয়ক গান,জামাই আগমনের গান, পূর্বরাগের গান, বধু জীবনের গান, সুখ-দুঃখের গান, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের গানসহ বহুগান এখানকার লোকসাধারনের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। যেমন কন্যা বিদায়কালীন একটি গান:

"মঙ্গল ঘট ও সারিসারি শুভ যাত্রা হরগৌরী
যাইত গৌরী কৈলাশ ভুবন গো মেনকা য়ে কান্দে।
ঘরে আছে পঞ্চবধূ তারা রইল সরমধু,
দিলা আনি য়া গৌরীর ও হাতে
অনেক দূরে কৈলাস পুরী ক্ষুধায় আকুল গৌরী
যাইতো গৌরী শ্বশুরের ও দেশে-
শশুরের দেশে গিয়া শশুরকে প্রণাম করিয়া
শাশুড়ি য়ে কোলে লইলা।"[৬]

তথ্যসূত্র:

১. তথ্যদাতা- নাম: শ্রীমতি প্রিয়াঙ্কা বালা পাল, বয়স:৭৫, লিঙ্গ-মহিলা, পেশা: গৃহিণী, ঠিকানা: উদয়পুর, গোয়ালগা, গোমতী ত্রিপুর, সংগ্রহের তারিখ-০৪/০৬/২০২৩
২. তথ্যদাতা- নাম: মতিলাল দেবনাথ, বয়স:৭২, লিঙ্গ- পুরুষ, পেশা: শ্রমিক, ঠিকানা: বিলোনিয়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা, সংগ্রহের তারিখ-০২/০৮/২০২৩
৩.তথ্যদাতা- নাম: রাখাল দাস, বয়স:৬২, লিঙ্গ- পুরুষ, পেশা: শ্রমিক, ঠিকানা: শিলাছরি, করবুক, গোমতী ত্রিপুরা, সংগ্রহের তারিখ-০৭/১১/২০২৩
৪. তথ্যদাতা- নাম: শংকর রবিদাস, বয়স: ৬৭, লিঙ্গ- পুরুষ, পেশা: শ্রমিক, ঠিকানা: মহারানী, উদয়পুর, গোমতী ত্রিপুরা, সংগ্রহের তারিখ-১২/১২/২০২৩
৫. তথ্যদাতা- নাম: মল্লিকা দে, বয়স:৭৯, লিঙ্গ- মহিলা, পেশা: গৃহিণী, ঠিকানা: অমরপুর, রাঙ্গামাটি, গোমতী ত্রিপুর, সংগ্রহের তারিখ-২১/১২/২০২৩

৬.তথ্যদাতা- নাম: স্বপন বর্মন, বয়স: ৬৭, লিঙ্গ- পুরুষ, পেশা: শ্রমিক, ঠিকানা: শান্তিরবাজার , দক্ষিণ ত্রিপুরা, সংগ্রহের তারিখ-০৯/০২/২০২৪

গ্রন্থপঞ্জী:

(১) দাশ, ড. নির্মল, লোকসংস্কৃতি প্রবন্ধ মালা, স্রোত প্রকাশনা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৭ খ্রি:।
(২) চক্রবর্তী, ড. দুলাল চন্দ্র, দক্ষিণ ত্রিপুরার লোকসাহিত্য ও ভাষা, নিউ পুথি ঘর, প্রথম প্রকাশ ২০১৫ খ্রি:।
(৩) সরকার, রঘুনাথ, ত্রিপুরার আদিবাসী লোককথা, ত্রিপুরা বাণী, প্রথম প্রকাশ:২০০৬ খ্রি:
(৪) দেবনাথ, হরিহর, লোকসংস্কৃতি ফেনী থেকে গোমতী, বই বাড়ি, প্রথম প্রকাশ ২০১৫খ্রি:।
(৫) দাস, জহর লাল, ত্রিপুরার লোকসংস্কৃতি বিষয়ক ও অন্যান্য প্রবন্ধ, জ্ঞান বীক্ষণ, প্রথম প্রকাশ: ২০১৭ খ্রি:।